॥ তৃতীয় অধ্যায় ॥

রবীন্দ্র পর্ব

কলকাতার জোড়াসাঁকোর অভিজাত ঠাকুর-বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব। দাস-দাসী, আত্মীয়-স্বজন,-পরিবৃত সংকীর্ণ ভৌগোলিক পরিধি অতিক্রম করতে তাঁর বিস্তর সময় লেগেছিল। সেই সময়ের পরিমান আনুমানিক ছত্রিশ বছর। কারাগার-সদৃশ বিদ্যালয়-গৃহ-ভীতি বালক রবীন্দ্রনাথকে পঠন-পাঠন থেকে দূরে ঠেলে দেয়। যা কিছু বিকশিত জীবনে শিক্ষা পেয়েছিলেন তা তাঁর স্বগৃহকে কেন্দ্র করেই আহৃত।

এই বাড়িতেই শিক্ষার এক নতুন আলো জ্বালেন রবীন্দ্রনাথের মেজদা সত্যেন্দ্রনাথ এবং সেজদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। তদুপরি হিন্দুমেলা-র আয়োজন এবং তার আদর্শ প্রণয়নে গুণেন্দ্রনাথ এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের তরুণ মনের নির্মল-ভাবনা রবীন্দ্রনাথের সামনে এক নতুন দিক উন্মোচন করে। প্রসঙ্গতঃ রবীন্দ্রনাথের স্বীকারোক্তি স্মরণযোগ্য :— "স্বদেশের প্রতি পিতৃদেবের যে একটি আন্তরিক শ্রদ্ধা তাঁহার জীবনের সকল প্রকার বিপ্লবের মধ্যেও অক্ষুণ্ণ ছিল, তাহাই আমাদের পরিবারস্থ সকলের মধ্যে একটি প্রবল স্বদেশ প্রেম সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছিল।" ১

বোধকরি এই গুণীসমাবেশের ভিতর চৌদ্দ বছরের বালক রবীন্দ্রনাথও নির্লিপ্ত থাকতে পারেন নি। স্বদেশ প্রেমের ডাকে জেগে ওঠেন এবং এই অপরিণত বয়সে 'হিন্দুমেলায় উপহার' ও 'প্রকৃতির খেদ' শীর্ষক কবিতাদ্বয়ে ঐতিহাসিক হিন্দুমেলার বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশে আকর্ষণযোগ্য করে তোলেন। উদ্ধৃতাংশটি তাঁর কচিমনের স্বাক্ষর :

(ক)

"ঝংকারিয়া বীণা কবিবর গায়
কেন রে ভারত কেন তুই হায়
আবার হাসিস। হাসিবার দিন
আছে কি এখনো, এ ঘোর দুঃখে।" দ্বিতীয় কবিতা (১৮৭৭)

১* রবীন্দ্রনাথ 'স্বদেশিকতা' | 'জীবনস্মৃতি' | পৃঃ ৭৭ | বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ/১৯৬৮ (বিশেষ সংস্করণ বৈশাখ ১৩৭৫)

(খ)

॥ হিন্দুমেলার উপহার (১৮৭৫) ॥

'শুনেছি আবার, শুনেছি আবার/রাম রঘুপতি লয়ে রাজ্যভার
শাসিতেন হায়, এ ভারতভূমি/আর কি সুদিন আসিবে ফিরে।

অথবা

এসেছিল যবে মহম্মদ ঘোরী/স্বর্গ রসাতল জয়নাদে ভরি
রোপিতে ভারতে বিজয় ধ্বজা/তখনো একত্রে ভারত জাগেনি।

এই হিন্দু মেলা-য় দেশ প্রেমের কবিতা পাঠ হত এবং শিল্প ব্যায়াম প্রভৃতি প্রদর্শনের সঙ্গে ভক্তিমূলক স্তব গীত হত। সকল নির্বাচিত প্রতিভাবানদের মর্যাদা দান এবং উৎসাহ বর্দ্ধনের নিমিত্ত যথোপযুক্ত পুরস্কারে সম্মানিত করা হত। এ সকল বিষয় রবীন্দ্রনাথের গোচরে ছিল। তাই শৈশবের শিক্ষা তাঁর কবিমনকে উপলব্ধির সম্ভার দিয়ে প্রগতির পথ দেখায়। পরাধীনতার ক্লেশ কত পীড়াদায়ক রবীন্দ্রনাথ তা মুখোমুখি দেখার সুযোগ পান সাম্রাজ্যবাদী লর্ড ডালহৌসির মতো কর্জনের রাজত্বকালেও। এই জনজাগরণ দেখে রবীন্দ্রনাথ নীরব থাকতে পারেন নি। তাঁর অন্তরলোক হতে উৎসারিত স্বদেশী কবিতা, সংগীত 'বঙ্গদর্শন' এবং 'ভাণ্ডার' পত্রিকায় প্রকাশ লাভ করায় স্বদেশপ্রেমীরা প্রভাবিত হন। 'বাউল' নামক গ্রন্থে এই বহুমূল্য রচনাগুলো সংযুক্ত আছে। বাংলার লোক সংগীতধর্মী 'স্বদেশীগান' গুলোর মধ্যে নমুনা হিসাবে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য :

১। 'ভাণ্ডার পত্রিকায়' — প্রকাশিত :

ক) 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে' — (একা)
খ) 'মা কি তুই পরের দ্বারে' — (মাতৃগৃহ)
গ) 'ছি ছি চোখের জলে ভেজাসনে' — (বিলাপী)

২। 'বঙ্গদর্শন'-এ প্রকাশিত :

ক) 'আমার সোনার বাংলা' — (সোনার বাংলা)
খ) 'ও আমার দেশের মাটি' — (দেশের মাটি)
গ) 'নিশিদিন ভরসা রাখিস' — (হবেই হবে)
ঘ) 'আমি ভয় করব না' — (অভয়)

রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশী সংগীত' এবং 'কবিতাধারা' স্বেচ্ছাব্রতী শিক্ষার্থীদের

সংগ্রামী মনোভাব সৃষ্টির ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে একটা অভূতপূর্ব্ব প্রেরণার প্রধান উৎস।

রবীন্দ্রনাথের দেশপ্রীতি, গণপ্রীতি স্বপ্ন-বিহার থেকে জাগেনি। তিনি কঠিন বাস্তবে প্রবেশ করেই তা অন্তর দিয়ে লাভ করেছেন। দেশ ভাবনার অস্থিরতা ধূমায়িত হতে কিছুটা সময় লাগে। এই যে বিলম্ব তা ইচ্ছা প্রসূত নয়, মানুষ রবীন্দ্রনাথ হবার পক্ষে তার যথেষ্ট প্রয়োজন ছিল। এই পরিসরটা বোধ করি ধরা যেতে পারে "শিলাইদহের কালকে"।

ঠাকুর এস্টেটের পরিচালনার প্রধান দায়িত্ব গ্রহণ করেই রবীন্দ্রনাথ কর্ম তৎপর হয়ে ওঠেন। তার পরিচয় তাঁর ছোট্ট চিঠিতে, বিলাতে জগদীশ চন্দ্র বসুর এক পত্রের উত্তরে :

"আপনি 'ক' বিন্দুতে কম্পমান, আমি 'খ' বিন্দুতে দিব্যি নিশ্চেষ্ট নিরুদ্বিগ্ন হয়ে বসে আছি — আমার চারদিকে আমন ধান এবং আখের ক্ষেত আসন্ন শরতের শিশিরাক্ত বাতাসে দোদুল্যমান। শুনে আশ্চর্য হবেন।

একখানা Sketch book নিয়ে বসে বসে ছবি আঁকচি। বলাবাহুল্য, সে ছবি আমি প্যারিস সেলোন-এর জন্য তৈরী করচিনে, এবং কোন দেশের ন্যাশনাল গ্যালারী যে এগুলি স্বদেশের ট্যাক্স বাড়িয়ে সহসা কিনে নিবেন এ রকম আশঙ্কা আমার মনে লেশমাত্র নেই।" ১

রবীন্দ্র-কবি-মানসের উৎস সন্ধান করতে গেলে নিঃসন্দেহে পদ্মা-গোরাই স্নাত শিলাইদহের কথা মনে জাগবে। মরমি বাউল কবি লালন সাঁই ফকির (যিনি লালন ফকির নামে পরিচিত), পল্লীকবি গগন হরকরা, সাধককাঙাল হরিনাথ মজুমদার, তান্ত্রিকাচার্য শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, কবিয়াল দধিমাস্টার, মীর মোশারফ হোসেন (বিখ্যাত 'বিষাদসিন্ধু' গ্রন্থ প্রণেতা) সাহিত্যিক জলধর সেন, অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, কীর্ত্তনিয়া শিবু সাহা প্রভৃতির সান্নিধ্যে স্থানটি তৎকালের প্রসিদ্ধি থেকে আজ ইতিহাস হয়ে রয়েছে। সেখানকার জীবনের উজ্জ্বল স্মৃতি বহন করে আনেন কবি শান্তিনিকেতন, বিশ্বভারতীতে। যে আদর্শ তাঁকে 'শ্রীনিকেতনের' রূপ দিতে প্রলুব্ধ করে।

১* রবীন্দ্র জীবনী ও রবীন্দ্র সাহিত্য প্রবেশক | শ্রীপ্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় | ১ম খণ্ড | বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় | সংশোধিত সংস্করণ ১৩৬৭ পৌষ : ১৮৮২ শক | পৃ : ৪৫৪।

ঠাকুর জমিদারির কর্মচারী শ্রীভূপেশ চন্দ্র রায় এবং শ্রীঅনঙ্গ মোহন চক্রবর্ত্তীকে ঐ কিশোর সংঘের অধ্যক্ষ করে দিয়ে প্রজাগণের মঙ্গল জনক কাজে আত্মনিয়োগ করতে উৎসাহিত করেন। এই অঞ্চলের সেকেণ্ড মাস্টার শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ডেকে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের অনুপ্রাণিত করার নির্দেশ দেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর শুভ কর্মসূচীকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করেন।

ক) হাতে কলমে কৃষি শিক্ষা।

খ) আদর্শ গ্রাম তৈরী।

গ) ব্রতী বালক দল গঠন।

শিলাইদহের জমিদারি গ্রহণ করেই রবীন্দ্রনাথ প্রজাদের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে এক বিস্তৃত অভিজ্ঞতা অর্জনে প্রয়াসী হন। কালীগ্রামে (পতিসর) 'মণ্ডলী' প্রথার প্রচলন করে জমিদারি প্রথার ভিত্তিমূলে আঘাত হেনে নির্মম তিরস্কার ভোগ করতেও কুণ্ঠা প্রকাশ করেন নি। বাংলার পুরাতন সামাজিক কাঠামো ভেঙ্গে ঢেলে সাজাবার স্বপ্নকে সার্থক করার জন্য তাঁর নিরলস কর্মোদ্যম ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে সহযোগীরূপে কেমব্রিজের স্নাতক এল, কে, এল্‌মহার্স্টকে পাওয়ায়, আশাতীত অনুপ্রেরণায় ৬১ বছরের পরিণত বয়সেও রবীন্দ্রনাথ তাই 'শ্রীনিকেতনের' প্রতিষ্ঠা করতে সম্পূর্ণ সক্ষম হয়েছিলেন।

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ড থেকে ফিরেই শিলাইদহের দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে এই গ্রাম জীবনের সঙ্গে পরিচিত হতে গিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন গ্রামের সমস্যা। ২৯ বৎসরের প্রথম 'পুণ্যাহ-সভা'-য় উপস্থিত কালে যে দরদী মনের স্বাক্ষর রেখেছিলেন, তা প্রসঙ্গতঃ উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। প্রচলিত প্রথামত 'পুণ্যাহ-অনুষ্ঠানে' প্রচুর অর্থ ব্যয়ে মহাসমারোহে প্রীতি ভোজের মধ্য দিয়ে প্রজা, আমলা এবং জমিদারের মহাসম্মেলনের আয়োজন হত। এই উপলক্ষে সদর কাছারির একতলার বিশাল কক্ষ পরিপাটি করে সাজানো হত এবং জাতিবর্ণ ভেদে পৃথক পৃথক আসনের ব্যবস্থা হত। নির্দ্দিষ্ট ভেলভেটে-মোড়ানো সিংহাসনে জমিদার বসবেন। রবীন্দ্র-পূর্ব সকল জমিদারই ঐ নিয়ম চালু রেখে এসেছেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথ পুণ্যাহ-সভায় প্রবেশ মাত্রই দেখতে পেলেন বৈসাদৃশ্য। মনে ব্যথা পেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সদর নায়েবকে ডেকে বললেন যে কথাগুলি, তা তাঁর অন্তরের সত্যিকারের পরিচয়:

(ক) "আজকের দিনে এই উৎসবে আমরা সবাই একাসনে বসবো। সেইটাই হবে আজকের এই শুভ উৎসবের সার্থকতা।"

(খ) "এ কখনও হতে পারবে না, সবার একাসন করে দিন—এই আমার হুকুম।"

গ) "আজ এমন একটা উৎসবের দিনেও কি আমরা একত্র মিলিত হবার সুযোগ হারাব? এটা যদি সত্যিই উৎসব-সভা হয়, তবে এখানে এসেও আমরা পরস্পরের ভেদ সৃষ্টি করে আমাদের মধুর সম্পর্কটা নষ্ট করে দেব? না, তা হবে না। সব চেয়ার সরিয়ে নাও। এস আমরা সবাই আজ একাসনে বসে আলাপ পরিচয় করি—উৎসব করি।

ঘ) "সদর নায়েব মশাইকে ডাক, তোমরা সবাই এস, সবাই এখানে বস। এস আমরা সবাই পুণ্যাহের উৎসব করি।" ১

জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি জানতে পারেন সারা দেশে এমন কত ক্ষুদ্র বৃহৎ সমস্যা রয়ে গেছে।

শ্রীনিকেতনের পত্তনের পূর্ব্বে সাংগঠনিক কাজের মধ্যে নিচের উল্লেখ্য কৃষি উন্নয়নের ব্যবস্থাবলী লক্ষ্য করলে তার সম্যক পরিচয় পাওয়া যাবে।

ক) উন্নত মানের আমেরিকান ভুট্টা চাষের ব্যবস্থা। খ) মাদ্রাজী সরু ধান, আলু প্রভৃতি চাষের ব্যবস্থা। গ) রেশম চাষের ব্যবস্থা।

ঘ) কুটির শিল্প ও গো-পালন কেন্দ্র স্থাপন। ঙ) সালিশী বিচারের প্রবর্তন (প্রজাদের মুখ চেয়ে বিনা ব্যয়ে বিচার)। চ) তাঁত-শালা স্থাপন। ছ) পাঠশালা, মধ্য এবং উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়।

জ) দাতব্য চিকিৎসালয়। ঝ) রাস্তা-তৈরী, পুকুর সংস্কার।

ঞ) পানীয় বিশুদ্ধ জলের জন্য কূপ খনন। ট) ধর্ম গোলা, ধানভাঙা কল স্থান। ঠ) বেকার চাষীর স্বার্থে পটারী (মৃৎ শিল্প) এবং ছাতা তৈরীর ব্যবস্থার আয়োজন। ড) কৃষি-ব্যাঙ্ক স্থাপন এবং নিজের নোবেল পুরস্কারের এক লক্ষ আটহাজার টাকা জমা রাখেন (গরীব চাষী প্রজাদের ঋণ পাবার স্বার্থেই এই মহৎ কর্ম প্রয়াস)।

এলম্‌হার্স্টের প্রধান সহযোগী কালীমোহন ঘোষ (১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে

১* শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ | শচীন্দ্রনাথ অধিকারী | প্রকাশক-জিজ্ঞাসা | প্রকাশকাল ২৫শে জানুয়ারী ১৯৭৪ | পৃঃ ৩৪০-৪১ |

শিলাইদহের পল্লী সংগঠন কাল থেকে) এবং সন্তোষচন্দ্র মজুমদার। এই কালীমোহন ঘোষ শারীরিক অপটুতা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের সর্ববিধ কল্যাণ কর্মে সঙ্গদান করেছিলেন। শ্রীনিকেতনের কর্মযজ্ঞে রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছায় সুবীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অসিতবরণ চট্টোপাধ্যায়, দেবব্রত ভট্টাচার্য, কুল প্রসাদ সেন, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, বুদ্ধ দাস, গোপাল বসু, পি, হরিহরণ, কিনটন রায় ও নিত্যেশ্বর নাগ প্রভৃতি ছাত্রবৃন্দ আত্মনিয়োগে উদ্বুদ্ধ হয়।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দ থেকে শ্রীনিকেতন নাম চালু হয়। গ্রামবাসীর মুখ্য সেবায় শ্রীনিকেতনের কার্যসূচী নির্দ্ধারিত হয়ঃ ক) কৃষি খামার খ) গোপালন কেন্দ্র। গ) ফল শব্জির বাগান। ঘ) মুরগি পালন কেন্দ্র। ঙ) তাঁত ও চর্ম শিল্প বিদ্যালয়। চ) চিকিৎসা কেন্দ্র। ছ) স্বাস্থ্য সমবায় সমিতি। জ) 'শিক্ষাসত্র' বিদ্যালয়। ঝ) লোকশিক্ষা সংসদ।

ঞ) গ্রামীন বিদ্যালয় শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্র। ট) বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় সমবায় কোষ। ঠ) ব্রতীবালক সংগঠন। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বভারতীর ১১ সংখ্যক ইংরেজী বুলেটিনে শ্রীনিকেতনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রকাশিত হয়। এখানে সে বুলেটিনের তথ্য পরিবেশন অপ্রয়োজনীয়। রবীন্দ্র-আগ্রহী পাঠকমাত্রেই তার কথা জানেন। শুধু এই বলি, রবীন্দ্র চেতনায় জনকল্যাণ এবং জনসমৃদ্ধির আন্তরিক ব্যাকুলতা যে কত গভীর ও ব্যাপক ছিল, এই কর্মসূচী তার উজ্জ্বল প্রমাণ। ১

শান্তিনিকেতন এবং শ্রীনিকেতনের মিশ্রিত ভাবাদর্শে বিশ্বভারতীর সৃষ্টি। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—আমার স্বদেশের লোক, যাঁরা অতিনিকটের অতিপরিচয়ের অস্পষ্টতা ভেদ করেও আমাকে ভালোবাসতে পেরেছেন আজ এই অনুষ্ঠানে তাঁদেরই বহু যত্নরচিত অর্ঘ্য সজ্জিত। তাঁদের সেই ভালবাসা হৃদয়ের সঙ্গে গ্রহণ করি। —

জীবনের পথ দিনের প্রান্তে এসে
নিশীথের পানে গহনে হয়েছে হারা।
অঙ্গুলি তুলি তারাগুলি অনিমেষে
মাভৈঃ বলিয়া নীরবে দিতেছে সাড়া।

১* দেশ | ৪৯ বর্ষ ২০ সংখ্যা | ৬ই চৈত্র ১৩৮৮, ২০শে মার্চ ১৯৮২ | সম্পাদক-সাগরময় ঘোষ | পৃঃ ২৪-২৫ ।

ম্লান দিবসের শেষের কুসুম তুলে
এ কূল হইতে নবজীবনের কূলে
চলেছি আমার যাত্রা করিতে সারা ॥" ১

শিলাইদহের এক নতুন জীবনে রবীন্দ্রনাথকে প্রবেশ করতে হয়েছিল। এই অঞ্চলে এসে তাঁর জীবনে জনসংযোগের প্রথম সুযোগ ঘটে। সেই সুবাদে রবীন্দ্রনাথ এই শিলাইদহ, পতিসর, কালীগ্রাম, সাজাদপুরে দেখতে পেলেন অশিক্ষিত চাষাভুষাদের জীবনযাত্রার ছবি। নিরন্নের হাহাকার দরদী কবি হৃদয়ে বেদনা জেগে ওঠে :

'ওই যে দাঁড়ায়ে নতশির
মূক সবে-ম্লান মুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর
বেদনার করুণ কাহিনী ;

উদ্ধৃতাংশটির মধ্যে মনুষ্যত্বের অবমাননাকারীর নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ক্ষুরধার ভাষা অনির্বাণ। গণচেতনায় উদ্বুদ্ধ রবীন্দ্রনাথ 'ছিন্ন পত্রাবলীর' ১৫ নং পত্রে ১২৯৭ সালের ২০শে মাঘ রবিবার, সাজাদপুর থেকে লেখেন :

"আমার মনে মনে হাসি পায়—আমার নিজের অপার গাম্ভীর্য এবং অতল স্পর্শ বুদ্ধিমানের চেহারা কল্পনা করে সমস্তটা একটা প্রহসন বলে মনে হয়। প্রজারা যখন সসম্ভ্রম কাতরভাবে দরবার করে এবং আমলারা বিনীত করজোড়ে দাঁড়িয়ে থাকে তখন আমার মনে হয় এদের চেয়ে এমনি কী মস্ত লোক যে আমি একটু ইঙ্গিত করলেই এদের জীবন রক্ষা এবং আমি একটু বিমুখ হলেই সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে। আমি যে এই চৌকিটার উপরে বসে বসে ভান করছি যেন এই সমস্ত মানুষের থেকে আমি একটা স্বতন্ত্র সৃষ্টি, আমি এদের হর্ত্তাকর্ত্তাবিধাতা, এর চেয়ে অদ্ভুত আর কী হতে পারে। অন্তরের মধ্যে আমিও যে এদেরই মতো দরিদ্র সুখ দুঃখ কাতর মানুষ ; পৃথিবীতে আমারও কত ছোটো ছোটো বিষয়ে দরবার, কত সামান্য কারণে মর্মান্তিক কান্না, কত লোকের প্রসন্নতার উপরে জীবনের নির্ভর। এই সমস্ত ছেলে-পিলে, গোরু-লাঙল-ওয়ালা সরল-হৃদয় চাষীভুষোরা আমাকে কী ভুলই জানে। আমাকে এদের সমজাতি মানুষ বলেই জানে না।" ২

১* ছিন্নপত্রাবলী | রবীন্দ্রনাথ | রবীন্দ্র রচনাবলী জন্মশত বার্ষিক সংস্করণ | একাদশ খণ্ড | প্রবন্ধ (২৫শে বৈশাখ | ১৩৬৮ | প: বঃ সরকার | পৃঃ ২৫।

২* আত্মপরিচয় | রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | প্রথম প্রকাশ ১ বৈশাখ ১৩৫০ | পৃষ্ঠা ৯৪—বিশ্বভারতী

একথা সত্য, রবীন্দ্রনাথের এই গণচেতনা এবং দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের পেছনে তৎকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রভাব পড়েছিল। উনিশ শতকীয় সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত বাঙালী মানসে যে দেশাত্মবোধ এবং গণদরদ তার উত্তরাধিকার স্বাভাবিক পথ ধরে এসে পৌঁছেছিল রবীন্দ্রনাথের মনোভূমিতে।

বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজকে সাহায্য করে যে 'স্বরাজ' লাভের আশা ছিল, তা বাস্তবায়িত না হওয়ায় গান্ধীজী সত্যাগ্রহ সংগ্রামে নামেন। এই সিদ্ধান্তের প্রতি রবীন্দ্রনাথের নীতিগত সমর্থন ছিল। ১৯১৩, ১৩ই এপ্রিল পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগের বীভৎস হত্যা লীলা জেনারেল ডায়ার কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথ এই ঘৃণ্য কর্মের জন্য ক্ষুব্ধ হয়ে সর্বোচ্চ সম্মান 'নাইটহুড' পরিত্যাগ করে মহান আদর্শ স্থাপন করেন। তৎকালীন রাজনীতির মধ্যে যে দীনতা ও ক্ষুদ্রতা দেখেছেন তাতে তিনি সংগ্রাম বিমুখ না হয়ে পারেন নি। এমন কি তীব্র উত্তেজনার মুখেও নিজেকে সরিয়ে রেখেছেন। এই কর্ম যদি পলায়নী মনোবৃত্তি হয়, তাও কবির কাছে শতগুণে শ্রেয়। কারণ তিনি মনে করেন এই দুর্বল ভিতের উপর প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। তাই তিনি অবিচারের বিরুদ্ধে, এবং নির্যাতিত মানুষের সপক্ষে নিরলস লেখনীর পথে নিজের প্রীতির পরশ রেখে যান। এই ভাবে তিনি বিশ্বমানবতা ও বিশ্বশান্তির জন্য আড়াল থেকেও অজস্র প্রতিবাদ পত্র লেখেন। রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে দূরে থেকেও গঠনমূলক পল্লী উন্নয়ন কাজকে প্রাধান্য দেন। উনিশ শতকের জগত রূপান্তরিত। মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার তাগিদ জাতীয় আন্দোলনের পথ ধরে বিশশতকে এসে সোচ্চার।

রবীন্দ্রনাথ নীরব না থেকে যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউরোপে প্রেম-মৈত্রীর ভিত্তিতে মহামিলনের বাণী পৌঁছে দেন। এবং সেই আদর্শের মূর্ত প্রতীক শিক্ষা সংস্কৃতির পীঠস্থান 'শান্তিনিকেতন'।

এশিয়া, আফ্রিকার মতো ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীর কাছে দক্ষিণ আমেরিকাও ছিল ঔপনিবেশিক শোষণ-ভূমি। কিন্তু বিশশতকের মুখে স্বদেশী সমাজে আন্দোলন, আন্দোলন থাকেনি, বিদ্রোহ থেকে বিপ্লবে রূপান্তরিত।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র, এবং শ্রীশচন্দ্র

মজুমদার, শৈলেশচন্দ্রের হাত বেয়ে রবীন্দ্রনাথের উপর এসে বর্তায়।

রবীন্দ্রনাথ কবি ও চিত্রকর। জীবনকে তাই অন্তঃস্থল থেকে দেখতেন। উচ্চ কল্যাণবোধ ও সংস্কৃতির প্রাণপুরুষ বলেই একদিকে সৌন্দর্য অন্যদিকে মনুষ্যপ্রেম কবিকে গণভাবনায় আকৃষ্ট করে। রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করে নিলেন :

"মানুষের অসম্মান দুর্বিসহ দুখে
উঠেছে পুঞ্জিত হয়ে চোখের সম্মুখে,
ছুটিনি করিতে প্রতিকার,
চিরলগ্ন আছে প্রাণে ধিক্কার তাহার।'

(জয়ধ্বনি : নবজাতক)

এই গ্লানি বুকে নিয়ে কবি অধীর হয়ে ওঠেন। অবশ্য আত্ম-সমালোচনার মধ্য দিয়ে সত্যের পরিচয় পেয়ে যান। তারই প্রকাশ ঘটে রবীন্দ্র সংস্কৃতির বহুমুখী ধারায়। গণআন্দোলনের মাধ্যম রূপে কবিতার একটা স্বতন্ত্র মূল্য আছে। ~~সে সাধনায় কবি মগ্ন।~~ কর্ম জীবনে প্রবেশ করে সভ্যতার সংকট প্রত্যক্ষ করেন। ফলে প্রতিবাদ ধ্বনিময় হয়ে ওঠে কবিতার আঙিনায়। তিনি ~~নেমে~~ আসেন স্বস্থান থেকে মধ্যবিত্তেরমধ্য দিয়ে সাধারণের ~~পাশে~~ ঃ [illegible]

"মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক,
আমি তোমাদেরি লোক
আর কিছু নয়
এই হোক শেষ পরিচয়।" (পরিচয় : সেঁজুতি)

এতবড় কথা বলা রবীন্দ্রনাথকেই মানায়। প্রগতিপন্থী কোন কবির কণ্ঠেও এই উচ্চারণ ~~বেমানান মনে হবে~~ কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে অবিশ্বাস করার উপায় নেই। কারণ কর্মে ও কথায় তার প্রমাণ যথেষ্ট মিলবে যদি নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তাঁর সাংগঠনিক ক্রিয়াকলাপের পর্যালোচনায় মন নিবিষ্ট করা যায়। ~~তাহলে নিশ্চিত~~ নিঃস্বার্থ আন্তরিক-তার পরিচয় ~~পাওয়া যাবে।~~

বিরাট প্রতিভাধর কবির মহাজীবনে অসীম অভিজ্ঞতা এসেছে কলকাতা, শিলাইদহ এবং শান্তিনিকেতনের ত্রিমুখী স্রোতধারা থেকে। এই ত্রিবৃত্তের জগত বিচিত্র মানুষ দর্শন করায় কবিকে। তিনি শত্রু, মিত্র

এবং কৃপাপাত্রবেশী মানুষদের সংস্পর্শে থেকেও সংযম রক্ষা করে চলেন। স্বার্থান্ধ মানুষগুলোর ভিতর থেকেই উজ্জ্বল জীবনের সাক্ষাৎ ঘটে তাঁর। তারা হল সাধারণ মানুষ। এই বাস্তব মানুষের পরিচয়ের লগ্ন থেকে কবির মনে পরিতৃপ্তি জাগে। তাই শোনালেন:

''মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।''

(প্রাণ : কড়িও কোমল)

রবীন্দ্রনাথের কবিতার ভিতর উনিশশতকের রামমোহন-ঈশ্বরচন্দ্রের সংস্কার-ধারা, বঙ্কিম-রাধাকান্তের সংরক্ষণধারা, ডিরোজিও-র 'ইয়ংবেঙ্গল'-ধারার সঙ্গে স্বগৃহের স্বাদেশিকতারধারা সমন্বিত ~~ছায়া মূর্ত উঠেছে।~~ তিনি সেই গণচেতনায় সাড়া দিলেন বিবেকের টানে। সর্বানুভূতির প্রকাশ রবীন্দ্র কাব্যে। গণসাধারণের মধ্যে বিশ্বমানবের মহান ঐতিহ্য লক্ষ্য করেন বলেই মানুষকে নিয়ে যত তাঁর ভাবনা। পার্থিব লাভ লোকসানের কথা বিস্মৃত থেকে প্রজা বিক্ষোভের পরিণাম সম্পর্কে শোষকেদের সতর্ক করে দেন। এই ক্ষুরধার নবচেতনার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত:

''দেখিলাম একালের
আত্মঘাতী মূঢ় উন্মত্ততা, দেখিনু সর্বাঙ্গে তার
বিকৃতির কদর্য বিদ্রূপ।'' (১৭ নং প্রান্তিক)

অথবা

''বিদায় নেবার আগে তাই
ডাক দিয়ে যাই
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।'' (১৮ নং প্রান্তিক)

মনে আর সন্দেহ থাকে না যে, এরাই কবির আকাঙ্ক্ষিত বৃহত্তর জনগণ। সাধারণ মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা 'আরোগ্য' কাব্যে বিশিষ্টতা অর্জন করেছে। গণজীবনের প্রতি কবির অকৃত্রিম দরদ প্রকাশ পায়: ''শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ পরে
ওরা কাজ করে।''

(দশ সংখ্যক : আরোগ্য)

মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও আন্তরিকতার সঙ্গে বিশ্বাস করেছেন:

'মহত্তম মানুষের স্পর্শ হতে হইনি বঞ্চিত
তাঁদের অমৃতবাণী অন্তরেতে করেছি সঞ্চিত।"

সামাজিক কর্তব্যের টানে রূঢ়তা ভেদ করে সাধারণের দলে মিশতে গিয়েও আভিজাত্যের সংক্রমন থেকে নিজেকে থাকতে পারেন নি। অকপটে স্বীকার করেছেন সেই কথা :

"মাঝে মাঝে গেছি আমি ওপাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে
ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিল না একেবারে।
... ...
আমার কবিতা, জানি আমি
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।"

(দশ সংখ্যক : জন্মদিনে)

এই স্বীকারোক্তির ভিতর বিনয়ী কবির দ্বিধার কথা বিশাল অন্তরের পরিচয় নিয়ে বিধৃত। আন্তরিকতার জলন্ত পরিচয়ে তাঁর বিপুল সাহিত্য-লোক উদ্ভাসিত, তবু একটা ক্ষীণ সংশয় থেকেই যায়। কারণ তিনি যতটা জীবনের সঙ্গে আপনার জীবনকে সংলগ্ন করে রাখুন না কেন সমাজের বনেদিয়ানার মঞ্চ অলক্ষ্যে একটা সূক্ষ্ম ব্যবধান নীরবে রচনা করে চলছেই। তবে তা সত্ত্বেও প্রীতির সূত্রে অন্তরে চিড় ধরেনি। সমাজকে এজন্য অবশ্যই মূল্য দিতে হবে একদিন। নিতান্ত অপ্রত্যাশিত হলেও রবীন্দ্রনাথের প্রাণশক্তির বন্যায় জাতীয়তাবাদ বিশ্বজাতীয়তার পথে বেগবান। কবির সে পরিচয় এখানে লক্ষ্যনীয় : 'ফুকারে তবে উচ্চরবে বাঁধিয়া এক সার—/মহৎ মোরা বঙ্গবাসী/আর্যপরিবার।"

(দেশের উন্নতি : মানসী)

মানুষের আত্মার ক্রন্দনে অধীর কবি স্বপ্ন-সৌধ ধূলিসাৎ করে গণজীবনের পক্ষ নেন ; 'এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে/দিতে হবে ভাষা, এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্নবুকে/ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা।'

(এবার ফিরাও মোরে : চিত্রা)

কঠোর বাস্তবে ফিরে যাবার কবির এই অসাধারণ বাসনা আদর্শের শিক্ষা দেয়। জমিদার কবি সাধারণ প্রজার বঞ্চিত জীবনের ব্যথায় চৈতন্যে আঘাত পেয়ে অশান্ত হয়ে ওঠেন। সেই নবজাগরণ প্রগতিশীল ভূমিকা নেয় কবির জীবনে। তিনি অকপটে স্বীকার করে নিলেন :

'এ জগতে হায় সেই বেশি চায় আছে যার ভূরি ভূরি
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।"

(দুই বিঘাজমি : চিত্রা)

দুর্বলের প্রতি সবলের চিরদিনের এই নির্যাতন চৌর্যবৃত্তিরই নামান্তর। কবি ঘৃণা করেন এই শোষকদের। কবি আত্মমগ্ন না থেকে বাস্তব সংসারের প্রতিটি দরজায় দরজায় ফিরেছেন। একজন বেতনভুক্ত দাসও তাঁর দৃষ্টি এড়াতে পারেনি। তাই কবির কণ্ঠেই উচ্চারিত :

"ছাড়ালে না ছাড়ে কী করিব তারে মোর পুরাতন ভৃত্য।"

কবির মহৎ আন্তরিকতা এখানে কতখানি বিবেকের পরিচয় তুলে ধরেছে তাঁর সাক্ষাৎ মেলে। মর্মস্পর্শী এই কাহিনী কবির মমতাকে হৃদয়ঙ্গম করায়, মনে রাখায়। ভারততীর্থ, দুর্ভাগাদেশ কবিতাদ্বয়ের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা-বাদ থেকে মনুষ্যজাতির মুক্তির কথা ঘোষিত। জাতিভেদের মতো ঘৃণ্য দৃষ্টিভঙ্গি পরিত্যাগ করে মহামিলনের বাসনায় মানুষকে সংঘবদ্ধ হতে হবে। কবির ভাষায় শোনা যাক :

"হেথায় আর্য, হেথা অনার্য/হেথায় দ্রাবিড়, চীন —/শক, হুন দল পাঠান মোগল/এক দেহে হল লীন।" (ভারততীর্থ : সঞ্চয়িতা)

অথবা

"তোমার আসন হতে যেথায় তাদের দিলে ঠেলে/সেথায় শক্তিরে তব নির্বাসন দিলে অবহেলে। /চরণে দলিত হয়ে /ধূলায় সে যায় বয়ে/ সেই নিম্নে নেমে এসো, নহিলে নাহিরে পরিত্রাণ /অপমানে হতে হবে আজি তোরে সবার সমান।" (দুর্ভাগা দেশ : সঞ্চয়িতা)

উপেক্ষিত এই বৃহত্তর জীবনের পাশে নেমে আসার ইঙ্গিতের মধ্যে কবির উপলব্ধির বিস্ফোরণ ঘটেছে। কবি বুঝতে পেরেছেন :

নিস্ফল হয়েছি আমি সংসারের কাজে/লোক মাঝে আঁখি তুলে পারি না চাহিতে। /মগ্ন থাকি আপনার মধুর তিমিরে/দেখিনা এজগতের প্রকাণ্ড জীবন।" (প্রাণ : কড়ি ও কোমল)

রবীন্দ্রনাথের এই সেই এসেছে স্বাভাবিক পথ ধরেই। সংস্কারক কবি মন তাই ব্যাকুল হয়েছে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে :

'হৃদয় আমার ক্রন্দন করে
মানব-হৃদয়ে মিশিতে।

(বিশ্বনৃত্য : সোনার তরী)

কারণ কবি এতোদিনে বুঝতে পেরেছেন :

"বিশ্বজনের পায়ের তলে ধূলিময় যে ভূমি সেই তো স্বর্গভূমি।"

'পুনশ্চ' কাব্যে সাধারণের সঙ্গে মিশতে পেরেছেন স্বাভাবিক ভাবে। 'শিশুতীর্থ' কবিতার মধ্য দিয়ে সেই মানুষের কথা জানালেন যার হাত দিয়ে আসবে মানুষের মুক্তি : "জয় হোক মানুষের,/ঐ নবজাতকের, ঐ চির জীবিতের"।

রবীন্দ্র প্রতিভার অভ্যুদয় রোমান্টিক গীতিকাব্যে হলেও এর রূপান্তর গতানুগতিকতার মধ্যে বদ্ধ থাকেনি। তাই তাঁর অগ্রগমন সর্বহারার দ্বারবর্ত্তী। ক্রান্তদর্শী ব্যক্তিত্বের অধিকারী বলেইতো উৎপীড়িতের অন্তর্লোক দর্শন করতে পেরেছিলেন। তাই তাঁর ন্যাশনালিজম, ইন্টারন্যাশনালিজমে উৎসারিত। 'কেরানী রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে অমল হোম, দরদী রবীন্দ্রনাথের একটা সত্যপরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন। রবীন্দ্রনাথকে যে দৃষ্টিকোণ থেকেই বিচার করুণ না কেন প্রাবন্ধিক তাঁর ব্যক্তিগত প্রতিফলন রেখেছেন তাঁর নিম্নোদ্ধৃত দৃষ্টান্তের মাধ্যমে।

"আপনার আমার মতো সাধারণ লোক, যারা খেটে খায়, আপিসে চাকরী করে, তাদের কথাই বলেছেন; তার চাইতে একটুও কম বলেন নি, দুঃখে পীড়িত, অভাবে ক্লিষ্ট, পরম সহিষ্ণু বাংলার পল্লীবাসীদের কথা। তাদেরই তিনি রূপে রসে মূর্ত্তি দিয়েছেন অপরূপ। সে-মূর্ত্তি মানুষের চিরন্তন মূর্ত্তি, দেশ ও কালের পাত্র ছাপিয়ে আসন নিয়েছে তা সকল কালের, সকল মানবের মর্মস্থলে।

রবীন্দ্রনাথই বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম বাঙলার বাস্তবজীবনের ছবি আঁকলেন তাঁর ছোট গল্পে। রোমান্স নয়, রাজা-রাজড়ার লড়াই নয়, বাঙলার পল্লীজীবনের সুখ-দুখের ছবি ঘনিষ্ঠ নিবিড় যোগে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ দেখা।" ১

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙলা নাট্যকর্মের ভিতর ইউরোপীয় আদর্শ এসে পড়ে। বিংশ শতাব্দীতে নাটকের গঠন প্রকৃতি পাল্টে যায়। রবীন্দ্রনাটকে তারই প্রতিফলন অভিনব। নাট্য-স্রোত-

---

১* 'কেরানী রবীন্দ্রনাথ' | প্রবন্ধ | অমল হোম | মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক | তৃতীয় খণ্ড | ধনঞ্জয় দাশ সম্পাদিত | দ্বিতীয় মুদ্রন, মহালয়া ১৩৮৭ | অক্টোবর ১৯৮০ | প্রকাশক—নতুন পরিবেশ প্রকাশনী | পৃঃ ১৩৩

ধারাকে তিনি ভাবগম্ভীর এবং অন্তর্মুখী করে তোলেন রূপক-প্রতীকের ব্যঞ্জনার ভিতর। রূপক-প্রতীকের অর্থ—তারতম্য যাই থাকুক উভয়েই একই উদ্দেশ্যের সঙ্কেত বহন করে। রবীন্দ্রনাটকে Suggession-র গূঢ় ইঙ্গিত ~~প্রযুক্ত হওয়ার ঘটনা কেন্দ্রিক সংঘর্ষ অতিক্রান্তের প্রয়াস~~ হৃদয়ের জাগরণকে অগ্রবর্তী স্থানে পৌঁছে দেয়। রবীন্দ্রনাথের নাট্য-জগতে বৈচিত্র্যের সমাবেশ ঘটলেও রূপক-প্রতীক একমাত্র নাটক যা রবীন্দ্র প্রতিভার নতুন বিকাশ ধারার উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য। এ স্থলে গণজীবনের প্রতি সমপ্রাণতাবোধের সুস্পষ্ট প্রকাশ দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিচের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নাটকে।

অচলায়তন (১৩১৮ সনের আশ্বিন মাসের 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়)
'মুক্তধারা' (১৩২৯ সনের বৈশাখ মাসের 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়)
রক্তকরবী (১৩৩১ সনে প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়) 'রথের রশি' ১৩৩৯ সনে ভাদ্রমাসে 'কালের যাত্রা-য় প্রকাশিত হয়।

উদ্ধৃত নাটকগুলোর মধ্যে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, অধিকাংশের [redacted] ঘটনা প্রধান হয়ে না [redacted] জন-মনে বিষয়ের আবেদন[redacted] ভাববাহী [redacted] হয়ে[redacted] উঠেছে।

এই নাটকগুলো সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনার তাৎপর্যে অভিনব। নাট্যশিল্পের জগতে রূপক-প্রতীক নাটকের মূলে এক অতীন্দ্রিয় সত্য অন্তর্লীন। সেই কারণে নাটকগুলোর মর্ম কথায় ধ্বনিত সর্বজনীন সত্যের জয়। কিন্তু আত্ম[redacted] স্বার্থের ক্ষুরধার চাতুর্য বাস্তবে তার প্রয়াস সিদ্ধির [redacted] ভিতর দিয়ে মানব কল্যাণকে বিঘ্নিত করে।

'অচলায়তন'—এ ধর্মের সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে কবির বিদ্রোহ ঘোষিত। মনের ক্ষুদ্রত্বের প্রাচীর ভেঙ্গে সর্বজাতির একাসন নির্মিতির মধ্যেই [redacted] সার্থকতার ইঙ্গিত স্পষ্ট।

'মুক্তধারা-য় কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ সৃষ্টিকারী যন্ত্ররাজের সংকীর্ণতার পরাজয়। [redacted] স্বার্থমুক্ত মানবাত্মার প্রতীক অভিজিৎ। তার মনুষ্যত্বের জাগরণে ব্যর্থ হয় শোষকের অভিসন্ধি।

'রক্তকরবী'-তে [redacted] সেই বীভৎস ক্ষুধার বিচিত্র রূপ। সমকালীন যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে রাশিয়া, আমেরিকা এবং ইউরোপ ঘুরে সেই চরম সত্যদর্শন করেন রবীন্দ্রনাথ। ফলে সমস্যা

ধূমায়িত। শক্তি-দম্ভের মুখে শোষিত, লাঞ্ছিত, জনগণ শাসন-দণ্ড ভাঙার জন্য মরীয়া হয়ে গণ-অভ্যুত্থানকে তরান্বিত করে। শ্রেণী স্বার্থ—দুষ্ট ধনতান্ত্রিক শাসন-কাঠামো গণজাগরণের মুখে যে একদিন নস্যাৎ হবেই এই নাটকের রূপক বিশ্লেষণের মধ্যে তা সঙ্কেত ধর্মী হয়ে উঠেছে।

'রক্তকরবী'-র সমস্যা নিত্যকালের। সামাজিক বৈষম্যের উজ্জ্বল প্রতিচ্ছায়া এখানে পড়েছে। ধনী, নির্ধনের মধ্যে আধিপত্যের সংঘাত জাগতিক বস্তুতে দুর্নিবার হয়ে ওঠে, ফলে নির্যাতনের শিকার হয় গণজীবন। মকররাজ আত্মদম্ভের বিকৃতিতে নিজের সর্বনাশ ঘটায়। মনুষ্যত্বের প্রতি অশ্রদ্ধা থেকে স্পষ্ট পতন লক্ষ্য করা যায়। এই নাটক রূপক-প্রতীকের অভ্রান্ত দৃষ্টান্ত।

'রথের রশি'-তে কৃত্রিম জাতবিচারের অসারতা প্রমাণিত। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মন্ত্রপাঠ, ক্ষত্রিয়ের বীরত্বের আস্ফালন, শ্রেষ্ঠী ধনপতির অর্থবলেও যে রথের চাকা নড়েনি, চড়েনি—শূদ্রের হাতের স্পর্শেই তা সচল।

তাই এখানে শোনা যায়: "আজকের মতো বলো সবাই মিলে। যারা এতদিন মরে ছিল, তারা উঠুক বেঁচে, যারা যুগে যুগে ছিল খাটো হয়ে তারা দাঁড়াক একবার মাথা তুলে।"—

রবীন্দ্রনাটকেও আত্মঘাতী সমাজ-বিন্যাসের ভিতর জনগণের বৃহত্তম অংশকে ঘৃণ্য নির্যাতনের ঘা খেয়ে দূরে সরে যেতে হয়েছে আবার অত্যাচারের সীমা লঙ্ঘন করলে এই দুর্বল শ্রেণীকেই আত্মমর্যাদা রক্ষার্থে হিংস্র হয়ে উঠতেও দেখা যায়। তখন এদের পাল্টা প্রতিরোধ শক্তিকে ঠেকিয়ে রাখা কোন বিপরীত শক্তির পক্ষেই, সম্ভব হয়নি।

রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, এই দুর্বল শ্রেণী ভালবাসার কাছে অনুগত আবার নির্যাতনকারীর প্রতি সংগ্রাম মুখী হতে কখনো কুণ্ঠা বা দ্বিধাগ্রস্ত নয়। নাটকগুলোর আভ্যন্তরীণ বিষয়বস্তু সেই গভীর সত্যকেই চাক্ষুষ করায়। 'রক্তকরবী'-র মকররাজ দ্বন্দ্ব-জড়িত চরিত্র। তাঁর কূটচক্রী অত্যাচারী আমলাদের হাতে নাম-গোত্রহীন কুলি-মজুরের দল নির্বিশেষে লাঞ্ছিত, সর্বনাশের আস্তাকুড়ে ছোবড়ার মতো অসাড়। কিন্তু রাজা বদ্ধ অন্ধকারে ঐশ্বর্যের ফাঁদে, লালসায় পূর্ণতার সাধ মিটিয়েও পরিতৃপ্ত হতে পারে নি। তাই তার কণ্ঠে শোনা যায়—"সর্বনাশ! আমার নিজের অন্ন আমাকে মানছে না।' সুদুর্লভা ও রহস্যময়ী মানবীর সংস্পর্শ সুখের

আশায় রাজাকে কাতর হতে দেখা যায়। স্থুল জীবন ভেদ করে জীবন শ্রীর আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তিতে নিজের মুখোস নিজেই ভেঙে ফেলে।

রবীন্দ্রনাথের রূপক-প্রতীকের বঙ্কিম পথ যত নির্মম-ই হ'ক রাজরোষ উপেক্ষা করার সামর্থ্য অর্জনে উদ্বুদ্ধ করেন জনগণ মনকে।

একমাত্র নাটকের আঙিনায় সাধারণ মানুষকে রবীন্দ্রনাথ বৃথা দাঁড় করাননি। সব আড়ালের ভিতর দিয়ে নিজেদের কথা তারা অকপটে বলতে পেরেছে, সার্থকতা এখানেই।

গণজীবন নিয়ে রবীন্দ্রনাথের লেখা সমস্ত কবিতাকে দুটো মোটা ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগে কবির আন্দোলিত হৃদয়াবেগ থেকে শোষিত গণজীবনের উদ্দেশ্যে কাব্যের উদ্যম প্রকাশিত হয়েছে। সে কবিতাগুলো হলো, 'এবার ফিরাও মোরে'; 'দুই বিঘা জমি': (চিত্রা), 'গীতাঞ্জলির ১০৭ ও ১০৮ সংখ্যক কবিতার অংশ 'প্রশ্ন' (পরিশেষ), 'ধারিকা' (১৩৪৩), 'মাধো': (ছড়ার ছবি) ইত্যাদি। গণজীবনের চিরস্থায়ী প্রাণশক্তির জগৎজোড়া সুস্থির কর্মশক্তি ঐকতান, (জন্মদিনে) কবিতার ভাবের অংশ বিশেষ। বিশেষ করে 'ওরা কাজ করে' (আরোগ্য) কবিতায় ছবিটি নির্লিপ্ত ভাবে দর্শন করেছিলেন কবি। 'রবীন্দ্র সরণি' গ্রন্থে অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী বলেছেন, '---- রোগ শয্যাশায়ী কবির চোখে (ডাকঘর-নাটকের অমলের মত) সমগ্র সমাজের বিচিত্র জীবন যাত্রার ছবি আলোয় জাগিয়া ওঠে।'